কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 MAR 2014
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

বিমল সরকার ▶

কলেজে কলেজে সমান্তরাল প্রশাসন

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের কোনো নাটক বা চলচ্চিত্রের কথা মনে হলেই মোটামুটি নির্দিষ্ট কয়েকজন অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও কল্পাকুশলীর চেহারা যেমন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তেমনি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন সেশনে ভর্তি ও পরীক্ষার ফরম পূরণের মৌসুম বা প্রসঙ্গটি এলেই কিছু ব্যক্তির নাম-চেহারা (যার যার এলাকার) মনের মাঝে উঁকি দেয়। প্রখ্যাত ওই শিল্পী-কলাকুশলীরা যেমন যার যার পারফরম্যান্স দেখিয়ে নাটক বা চলচ্চিত্রটিকে সার্থক করতে একাগ্রচিত্তে সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান, তেমনি ওই ব্যক্তিদের 'সহায়তা' বা 'কৃপাদৃষ্টি' ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও ফরম পূরণ প্রক্রিয়া ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন করতে হয়। ওই সব ব্যক্তি ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভর্তিকাজে এবং ফরম পূরণের সময় পরীক্ষার্থীদের 'করেন 'সহযোগিতা' আর প্রতিষ্ঠান-প্রশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করেন 'কৃপাদৃষ্টি'। এক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে কলেজগুলোতে নতুন সেশনে ভর্তি, পরীক্ষার ফরম পূরণ এবং বেতনাদি পরিশোধের সময় যেসব অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত ও অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন এমন সব ব্যক্তির কাছে ভাবনারও অতীত বলে মনে হতে পারে। এখন দেশে ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা খুবই কম।, বেশির ভাগ কলেজই ডিগ্রি স্তরের। এ ছাড়া প্রায় ৬০০ কলেজে রয়েছে অনার্স কোর্সে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। মাস্টার্স কোর্স চালু আছে এমন কলেজের সংখ্যাও বোধকরি ২০০-এর কাছাকাছি হয়ে যাবে। উপজেলা পর্যায়ের কলেজগুলোতেই আজকাল দুই-তিন হাজার, এমনকি আরো বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। জেলা সদর বা বড় বড় শহরের একেকটি কলেজে ১০ হাজার, ২০ হাজার, এমনকি এর চেয়েও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। প্রতিবছর একাদশ, স্নাতক (পাস ও অনার্স), মাস্টার্স শ্রেণী বা কোর্সে ভর্তির সময় হাজার হাজার, এমনকি লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য সংঘটিত হয়। একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন ধরনের খবরের এখন আর কোনো রাখঢাক নেই। চূড়ান্ত পরীক্ষার (ফাইনাল) ফরম পূরণের সময়ও প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। দেশে প্রচলিত নষ্ট-ভ্রষ্ট রাজনীতি ও লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির নামেই যে মূলত এসব ঘটে থাকে কিংবা ঘটে চলেছে, এ কথা অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই।

মাধ্যমিক স্কুলগুলোর যাবতীয় কর্মকাণ্ডে রাজনীতি যেমন, তেমন ছাত্ররাজনীতির প্রভাব বা কুপ্রভাব খুব একটা লক্ষ করা যায় না। কিন্তু কলেজগুলোর বেলায় দেখা যায় উল্টো চিত্র। নতুন সেশনে ভর্তি এবং একেকটি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়টিতে একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। আজ থেকে পাঁচ মাস আগে নতুন সেশনে ভর্তি ও বেতনাদি নিয়ে সিলেটের একটি স্বনামখ্যাত কলেজে কী কাণ্ডটাই না ঘটে গেল। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী যে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি, সেখানে ১৪০০ শিক্ষার্থী ভর্তির আনুমানিক ৭০ লাখ টাকার প্রায় পুরোটাই মেরে দিয়েছেন কথিত ছাত্রনেতারা! মন্ত্রী ও কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি এলাকায় গিয়ে এসব শুনে বিস্মিত ও একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন বলে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। কাউকে শাসন করতে কিংবা ক্ষোভ বা অভিমান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে 'রাবিশ', 'ইডিয়ট', 'স্টুপিড', 'বেয়াদব' এবংবিধ শব্দ উচ্চারণ করতে মোটামুটি অভ্যস্ত ওই মন্ত্রী 'বদমাশ' শব্দ উচ্চারণসহ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কলাকুশলীদের ভর্ৎসনা করে রাজধানীতে ফিরে আসেন তখন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষামন্ত্রীও এসবের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জের সোনালী ব্যাংকের ভল্ট থেকে চুরি যাওয়া সাড়ে ১৬ কোটি টাকা মাত্র তিন দিনের মধ্যে দুর্ধর্ষ চোরসহ উদ্ধার করার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি তো এখনো মানুষের মুখে মুখেই উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তথাকথিত ছাত্রনেতাদের মেরে দেওয়া টাকা কখনো উদ্ধার হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত কয়টি আছে, কিংবা আদৌ আছে কি না আমার জানা নেই। ৭০ লাখ টাকা উদ্ধার করা গেলে (সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে পূর্ব দিকে অস্তমিত হলেও প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যা কোনো দিনই সম্ভব নয়) তা দিয়ে যা করা যেত—একটি প্রাইমারি স্কুলের সব শিক্ষককে অন্তত ১৫ বছর পর্যন্ত একনাগাড়ে বেতন প্রদান বা একটি হাই স্কুল বা মাদ্রাসার সব শিক্ষককে অন্তত আট বছরের বেতন প্রদান বা একটি কলেজের শিক্ষকদের অন্তত পাঁচ বছরের বেতন দেওয়া যেত।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভর্তি, ফরম পূরণ বা এবংবিধ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে শিক্ষকদের নিয়ে পৃথক কমিটি গঠন করা হলেও আর্থিক মূল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে উল্লিখিত সিন্ডিকেটই। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত কমিটি এবং অফিস স্টাফ সবাই ওদের কাছে জিম্মি। বিভিন্ন উপলক্ষে তারা নিজেরাই টাকা নির্ধারণ করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে

সিলেটের কলেজটিতে ভর্তি, ফরম পূরণ এবং বেতন আদায়-বাণিজ্যের যে বর্ণনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা অনেকটা এরূপ—জনৈক ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে সাতজন এবং ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে পাঁচজন মোট ১২ জনের একটি সিন্ডিকেট পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উভয় সংগঠনের মূল দুই নেতাসহ অন্যরা টাকা আদায়ের সময় এলেই অফিস কক্ষসহ ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্পটে দুজন করে নিজেদের লোক বসিয়ে রাখে। শত শত, এক হাজার, এমনকি সময়ভেদে এরও বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীর আর্থিক লেনদেন তাদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভর্তি, ফরম পূরণ বা এবংবিধ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে শিক্ষকদের নিয়ে পৃথক কমিটি গঠন করা হলেও আর্থিক মূল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে উল্লিখিত সিন্ডিকেটই। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত কমিটি এবং অফিস স্টাফ সবাই ওদের কাছে জিম্মি। বিভিন্ন উপলক্ষে তারা নিজেরাই টাকা নির্ধারণ করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে। সংগৃহীত টাকার সামান্য কলেজে জমা দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকটা জোরপূর্বক ভর্তি করান। পরে উদ্বৃত্ত টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। বলা হয়েছে, এক যুগ ধরে মৌসুম এলেই শিক্ষার্থী ও কলেজ প্রশাসনকে জিম্মি করে ওই বাণিজ্য চলছে।

সিলেট আধ্যাত্মিক নগরী বলে পরিচিত। এটি দেশের পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী শহরগুলোর অন্যতম। এ ছাড়া উল্লিখিত কলেজটিও ইংরেজ আমল থেকেই স্বনামখ্যাত। এমন একটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বিখ্যাত একটি কলেজে, যার গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী—যদি এমন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে এবং তা বছরের পর বছর ধরে, তাহলে দেশের অন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কী ঘটতে পারে বা কী ঘটছে, তা সচেতন সবার কাছে সহজেই অনুমেয়। রাজধানী, বড় শহর, জেলা সদর ও উপজেলা সর্বত্র সব ধরনের কলেজে বলতে গেলে একই অবস্থা। এ যেন 'কলেজে কলেজে সমান্তরাল প্রশাসন'।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায়, এমনকি শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারণ কাজেও আমার সমসাময়িক বা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ অনেকেই জড়িত আছেন। অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে আমার যোগাযোগ এবং তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছুই জানার সুযোগ হয়। লক্ষ করার বিষয়, নানা দুর্বিপাক-দুর্দিন এবং প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের সত্তাবিকাশের দরকারের সময় যাঁরা ক্যাম্পাসে নিজের ছায়াটি পর্যন্ত মাড়ান না, মাড়াবার প্রয়োজন অনুভব করেন না; সে সব ছাত্রনেতা, সাবেক ছাত্রনেতা এবং নানা কিসিমের বহিরাগতরা একেকটি মৌসুমে হঠাৎ এসে আবির্ভূত হন। এ ক্ষেত্রে নেতা-কর্মী এবং ক্যাডার ও মাস্তানের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান নেই। সব যেন একাকার। হুমায়ূন আহমেদের নাটক ও চলচ্চিত্রের পারফরমারদের মতোই এ যেন ঘুরেফিরে একই মুখ। এলাকায় যাঁরা বাস করেন তাঁদের কেন্দ্রায় তো কোনো কথাই নেই। অন্যরা দেশের যে প্রান্তে কিংবা যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই থাকুন না কেন, নিমেষে এসে জড়ো হন। নিজেদের তৈরি ছক বা রোডম্যাপ অনুযায়ী কাজ হাসিল করার পর যাঁর যাঁর মতো করে কেটে পড়েন। উল্লেখ্য, কেবল সরকারি দলের ছত্রচ্ছায়াধীন নয়, বিরোধী দলের ছত্রচ্ছায়াধীন থেকেও চিহ্নিত ওই কুশীলবরা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে অনুপাতভেদে এসব কর্ম করে চলেছেন। ভর্তি, ফরম পূরণ, বেতনাদি আদায়, বার্ষিক ক্রীড়া, মিলাদ বা পূজা অনুষ্ঠান মোট কথা অর্থবিষয়ক কোনো কিছুই যেন তাঁদের 'সিলেবাসবহির্ভূত' নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এভাবে আর কত দিন?

লেখক: সহকারী অধ্যাপক
বাঞ্ছিতপুর কলেজ, কিশোরগঞ্জ